ATHENA, VOLUME VII, JULY 2023 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 148-159
www.athenajournalcbm.in

‘দি সেকেন্ড সেক্স’:
নারী সত্তার সংজ্ঞা নির্মাণের এক অনন্য পাঠ

অমৃতা চ্যাটার্জী*

প্রাপ্ত: ২৪/০২/২০২৩ পরিমার্জন: ৩০/০৫/২০২৩ গৃহীত: ০৯/০৬/২০২৩

সারসংক্ষেপ: *আদিম মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিকরা বলেন, সভ্যতার আদি স্তরে মাতৃ-বিধি অনুসারে মানুষের বংশ পরিচয় নির্ধারিত হত। সন্তান-সন্ততিরা বিষয়-সম্পত্তির অধিকার পেত মায়ের দিক অনুসারেই। কৃষির প্রচলনের ফলে ধনদৌলত বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিক দিয়ে পরিবারে নারীর তুলনায় পুরুষের মর্যাদা বেড়ে যায়, অপরদিকে, পুরুষ পুরাতন উত্তরাধিকার প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করে আপন ছেলেমেয়েদের সুব্যবস্থা করবার জন্য এই বর্ধিত মর্যাদার সুযোগ গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হয়। নারী আন্দোলনের সূচনাকাল হিসেবে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তিপর্বে ফরাসি বিপ্লবের সময়কালকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। নারীবাদীদের একাংশের ধারণা ছিল নারী ভোটাধিকার লাভ করলেই নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীভূত হবে। কিন্তু ভোটাধিকার লাভের পরও সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় ফরাসী অস্তিবাদী দার্শনিক সিমোন দ্য বোভোয়ার বিরচিত The Second Sex গ্রন্থটি। গ্রন্থটি নারীবাদী চিন্তার এক নতুন দিক উন্মোচিত করে। গ্রন্থটি আইনি-সাংবিধানিক সাম্য থাকা সত্ত্বেও কেন নারীরা সমাজে পুরুষদের তুলনায় নিম্নতর অবস্থানে থাকে তার ব্যাখ্যা দেয়। বোভোয়ার বলেন, পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ ও সংস্কৃতিকেই গ্রহণযোগ্য নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং সমস্ত ধরনের চর্চার মধ্যে দিয়ে পুরুষই প্রধান ও নারী অপর —এ কথাই বলা হয়, ও এই চিন্তা সমাজের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হতে থাকে। সিমোন দ্য বোভোয়ারকে অনুসরণ করে নারী জীবনের বিভিন্ন স্তরে নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণপূর্বক নারীর এই সর্বাত্মক অপরতাকেই নারীবাদী তত্ত্বের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করা হবে এই প্রবন্ধে।*

সূচক শব্দ: *নারী, নারীবাদ, সিমোন দ্য বোভোয়ার, দ্বিতীয়লিঙ্গ, অপরসত্তা, লিঙ্গ-বৈষম্য।*

---

* পিএইচ.ডি. গবেষক, দর্শন বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail: amrita.philosophy@gmail.com

নারীবাদী আন্দোলনের পর্যায়গুলিকে 'নারীবাদের তরঙ্গ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। পশ্চিমী নারীবাদে সক্রিয় আন্দোলনের এই ধারাকে তিনটি পর্বে ভাগ করে প্রথম তরঙ্গের নারীবাদ বা ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজম, দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদ বা সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজম এবং তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদ বা থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজম নামকরণ করা হয়ে থাকে। নারীবাদের প্রথম পর্বে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে নারীর শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের মামলা, কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এই সময়ে নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে বিভিন্ন স্থানে নানা সংগঠন গড়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Susan B. Anthony ও Elizabeth Cady Stanton-এর নেতৃত্বে 'National Women Suffrage Association' এবং Lucy Stone-এর নেতৃত্বে 'American Women Suffrage Association' গড়ে ওঠে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ফলস্বরূপ প্রথমে ব্রিটেনে (১৯১৮) এবং পরের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (১৯২০) মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সমসাময়িক নারীবাদী আন্দোলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন, Mary Wollstonecraft। তাঁর রচিত A Vindication of the Rights of Women (১৭৯২) হল নারীবাদের প্রথম আকর গ্রন্থ। এছাড়াও জন স্টুয়ার্ট মিল The Subjection of Women (১৮৬৯) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন, যা নারীবাদী আন্দোলনকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই প্রবন্ধে মিল প্রচলিত বৈবাহিক ব্যবস্থা, সমাজ ও তাঁর রক্ষণশীলতা, শিক্ষার অভাব, নারীকে কিভাবে শোষণ করে চলেছে তা বর্ণনা করেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিলের স্ত্রী হ্যারিয়েট ট্রেলার বিরচিত The Enfranchisement of Women (১৮৫১) শীর্ষক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নারীবাদের প্রথম তরঙ্গে সমাজে নারী ও পুরুষের বৈষম্যমূলক অবস্থান তথা নিম্নতর অবস্থান, নারীর ভোটাধিকার অর্জন, সাংবিধানিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপিত হলেও, নারীর যৌনতা, যৌন স্বাধীনতা, নিজের শরীরের উপর নারীর অধিকার, গর্ভপাতের অধিকারের মত স্পর্শকাতর বিষয়গুলিতে তেমন আলোকপাত করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গে এই বিষয়গুলি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য নারীবাদী গ্রন্থগুলি হল— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নারীবাদী দার্শনিক বেটি ফ্রাইডেন বিরচিত The Feminine Mystique (১৯৬৩), ফরাসী অস্তিবাদী দার্শনিক সিমোন দ্য বোভোয়ার বিরচিত The Second Sex (১৯৪৯) গ্রন্থটি। গ্রন্থটি নারীবাদী চিন্তার এক নতুন দিক উন্মোচিত করে। বোভোয়ারের গ্রন্থটি আইনি-সাংবিধানিক সাম্য থাকা সত্ত্বেও কেন নারীরা সমাজে পুরুষদের তুলনায় নিম্নতর অবস্থানে থাকে তার ব্যাখ্যা দেয়। গ্রন্থটি নারীবাদের দ্বিতীয় পর্বের আন্দোলনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। এছাড়াও Kate Millett বিরচিত Sexual Politics (1970) গ্রন্থটি। Germaine Greer বিরচিত The Female Enuch (1970) গ্রন্থটি। নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গে Virginia Woolf-এর A Room of One's Own প্রবন্ধটিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারী সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু অধিকার অর্জন করলেও সেই সফলতার মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল। নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গের সূত্রপাত ১৯৯০-এর গোড়ার দিকে। ১৯৯০-এর কিছু আগে থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদী যেমন, Audre Lorde, Gloria Anzaldúa প্রমুখ ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন যে দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদ মূলতঃ উচ্চ, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, শ্বেতাঙ্গ নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকেই সমস্যাগুলিকে দেখে। কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের সমস্যা ও অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে উপেক্ষিত এবং এতকাল যাবৎ নারীবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অর্জিত অধিকারগুলি শ্বেতাঙ্গ ও উচ্চবিত্ত নারীরাই ভোগ করে আসছে বলে মনে করেন তাঁরা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আঞ্চলিক পরিবেশ অনুসারে নারীর সমস্যাও ভিন্ন ভিন্ন। তাই এই সকল সমস্যার সমাধান এক হতে পারে না। তাই তৃতীয় পর্বে নারীবাদীরা নারীর সমস্যাগুলিকে নির্দিষ্ট করে সেগুলিকে সমাধানে মনোনিবেশ করেন। অনেকের মতে নারীবাদে চতুর্থ তরঙ্গ শুরু হয়ে গেছে। তথ্যপ্রযুক্তির অসাধারণ উন্নতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী নারীদের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করা আজ কঠিন নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন

সংস্কৃতির, নারীরা ধর্ম, বর্ণ, অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে বিশ্ব শান্তি ও ন্যায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

"One is not born, rather becomes a woman."[১] সিমোন দ্য বোভোয়ারের এই উক্তিটির ব্যবহার আজ গণমাধ্যমে বহু প্রচলিত এবং বহুল চর্চিত। আজও উক্তিটির বহুল ব্যবহারই প্রমাণ করে যে, উক্তিটি আজও প্রাসঙ্গিক। একটি শিশুসন্তানকে নারী নামক গৌণ সত্তারূপে গড়ে তুলবার যে লিঙ্গ রাজনীতি তা আজও বহাল তবিয়তেই বর্তমান।

আদিম মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে বিশিষ্ট সমাজবাদী দার্শনিক ফ্রেডরিক এঙ্গেলস বলেন,"এমন সামাজিক পরস্থিতির সন্ধান মিলে, যেখানে পুরুষ বহুবিবাহ, আর স্ত্রীর বহু-স্বামিত্বের (polyandry) সুযোগসুবিধা একই সময়ে, একইভাবে উপভোগ করে, আর তাদের ছেলেমেয়ে স্কুলের সর্বজনীন ছেলেমেয়েতেই পরিণত হয়। এই প্রাথমিক অবস্থাটা পরিবর্তনের সুদীর্ঘ ধারা ও উপধারার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত একপতি-পত্নীত্ব বা এক বিবাহে এসে ঠেকে"[২]। সভ্যতার আদি স্তরে মাতৃ-বিধি অনুসারে মানুষের কুল, বংশ, ইত্যাদি পরিচয় নির্ধারিত হত। সন্তান-সন্ততিরা বিষয়-সম্পত্তির অধিকার পেত মায়ের দিক অনুসারেই। কৃষির প্রচলনের ফলে "ধনদৌলত বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিক দিয়ে পরিবারে নারীর তুলনায় পুরুষের মর্যাদা বেড়ে যায়, অপরদিকে, পুরুষ পুরাতন উত্তরাধিকার প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করে আপন ছেলেমেয়েদের সুব্যবস্থা করবার জন্য এই বর্ধিত মর্যাদার সুযোগ গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হয়।"[৩] 'জননী-বিধির উচ্ছেদ সাধন, নারীজাতির বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয় নির্দিষ্ট করে ছিল। পুরুষ গৃহেও কর্তৃত্ব অধিকার করে; নারী অবনমিত হয়, গোলামি স্বীকার করতে তাকে বাধ্য করা হয়; নারী কেবল পুরুষের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ক্রীতদাসী, আর সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়;"[৪]।

সক্রিয়ভাবে নারী আন্দোলনের সূচনাকাল হিসেবে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্বে ফরাসি বিপ্লবের সময়কালকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার এই আন্দোলনে মহিলাদের ব্যাপক হারে যোগদান লক্ষ্য করা যায়। রাজতন্ত্রের বিরোধিতা ছাড়াও মহিলাদের এই ব্যাপক হারে যোগদানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবসান ঘটিয়ে আত্যন্তিক সাম্যের সূচনা করা, এবং নারীর প্রাপ্য অধিকার অর্জন করা। তাই ফরাসি বিপ্লবের সময় কালকেই প্রথম নারীবাদী আন্দোলনের সূচনাকাল বলা যায়। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের সমাপ্তিপর্বে নারীর সমানাধিকার প্রাপ্তির বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়ে। পুরুষের সীমিত ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেও নারীর ভোটাধিকারের বিষয়টি পুনরায় উপেক্ষিতই থেকে যায়। পুরুষের অধিকার বিষয়ক ইস্তেহার ফরাসি সংসদে গৃহীত হয়, যার নাম—"*Declaration of the Rights of Men*"– এটি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে আগস্টের শেষ সপ্তাহে বিপ্লব চলাকালীন ফ্রান্সের নবগঠিত গণপরিষদে গৃহীত হয়। এটি ফরাসি বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে স্বীকৃত, যেখানে ফরাসি নাগরিকদের অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। আলোকপ্রাপ্তির যুগের চিন্তা, রুশোর সামাজিক চুক্তি ও তাঁর দর্শন, মন্তেস্কুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি এবং ১৭৭৬ সালের মার্কিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, উল্লিখিত ঘোষণাপত্রটির ওপর পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছিল।

কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই ফরাসি নাগরিকদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে নারীর অবস্থানটি অবহেলিত হয় আবারও। এই সময়ে নারীর অধিকারের দাবি নিয়ে যে আন্দোলনকারীদের নাম প্রথমেই উঠে আসে, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন Olympe de. Gauges। তিনি ফরাসি সংবিধানে গৃহীত '*Declaration of the Rights of Men*' -এই ইস্তেহারের প্রতিবাদস্বরূপ– *'Declaration of the Rights of Women'* (১৭৯১) ফরাসি সংসদে পেশ করেন। ঘোষণাপত্রটিতে গুজ নারীর শিক্ষা, বিবাহ এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমান অধিকারের দাবি করেন। তাঁর মতে নারী ও পুরুষের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব হওয়ায় চিন্তা ও মত প্রকাশে নারীও পুরুষের ন্যায় সমান স্বাধীনতা লাভ করার অধিকারী। Gauges-এর এই ঘোষণাপত্রটি নানাভাবে সমালোচিত হলেও ফ্রান্সের সরকার কতগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হন, যদিও এই গৃহীত প্রস্তাবগুলি অভিজাত সম্প্রদায়ের নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

নারীবাদের প্রথম পর্বে নারী শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের মামলা, কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, সম্পত্তির

অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এর মধ্যে কিছু অধিকার আইনের স্বীকৃতি পেলেও বাস্তবক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য একই রূপে বহাল ছিল। আসলে এই আমূল পরিবর্তনের জন্য কেবল আইনি স্বীকৃতি যথেষ্ট ছিল না, তার সাথে প্রয়োজন ছিল সেই পরিবর্তনকে গ্রহণ করার জন্য সমাজকে অন্তর থেকে সাবালক করে তোলা। পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাতদুষ্ট সমাজে এই সকল আইনগুলিকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

এই সময়ে নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে বিভিন্ন স্থানে নানা সংগঠন গড়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Susan B. Anthony ও Elizabeth Cady Stanton-এর নেতৃত্বে 'National Women Suffrage Association' এবং Lucy Stone-এর নেতৃত্বে 'American Women Suffrage Association' গড়ে ওঠে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ফলস্বরূপ প্রথমে ব্রিটেনে (১৯১৮) এবং পরের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (১৯২০) মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

নারীবাদীদের একাংশের ধারণা ছিল নারী ভোটাধিকার লাভ করলেই নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীভূত হবে। কিন্তু ভোটাধিকার লাভের পরও সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আইনগত বাহ্যিক স্বীকৃতি নারীকে কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে পারলেও, পরিবারের অভ্যন্তরে নারী একই রকম পুরুষের বঞ্চনা ও অবদমনের শিকার হয়ে চলেছিল।

১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় ফরাসী অস্তিবাদী দার্শনিক সিমোন দ্য বোভোয়ার বিরচিত The Second Sex গ্রন্থটি। গ্রন্থটি নারীবাদী চিন্তার এক নতুন দিক উন্মোচিত করে। বোভোয়ারের গ্রন্থটি আইনি-সাংবিধানিক সাম্য থাকা সত্ত্বেও কেন নারীরা সমাজে পুরুষদের তুলনায় নিম্নতর অবস্থানে থাকে তার ব্যাখ্যা দেয়। পিতৃতান্ত্রিক নিয়ম বা নীতিকে আদর্শ নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে সমাজে। সমস্ত ধরণের চর্চা ও চর্যার মধ্যে দিয়ে পুরুষই প্রধান সত্তা বা Primary Self; —এ কথাই চিন্তনের অতি গভীরে প্রবেশ করানো হয়ে থাকে জন্মলগ্ন থেকেই। সর্বত্র নারীদের এই পিতৃতান্ত্রিক চিন্তা বা বুদ্ধির সঙ্গেই লড়াই করতে হয়। পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ ও সংস্কৃতিকেই গ্রহণযোগ্য নিয়ম বা নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং সমস্ত ধরনের চর্চার মধ্যে দিয়ে পুরুষই প্রধান ও নারী অপর —এ কথাই বলা হয়, ও এই চিন্তা সমাজের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হতে থাকে। শ্রীমতি বোভোয়ার বলেন যে, জৈবিক নিয়ম অনুসারে ছেলে মেয়ের পার্থক্য স্বাভাবিক কিন্তু সামাজিক প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে ছেলের পৌরুষ (Masculinity) ও মেয়ের নারীত্ব (Femininity) তৈরি করে।

শ্রীমতি বোভোয়ারের জন্ম প্যারিসে ১৯০৮ সালে। পিতা জর্জে বেরত্রাঁ বোভোয়ার পেশায় ছিলেন আইনজীবী, মাতা ছিলেন ফ্রাঁসোয়া ব্রাসোয়া। ১৯২৯ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে সরবনে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক হন তিনি। কথিত আছে যে, ফ্রান্সে তাঁর আগে এত কম বয়সে এই ডিগ্রী অর্জন করতে কেউ পারেনি। এই পরীক্ষায় যাঁ পল সার্ত্রে (Jean-Paul Sartre) ছিলেন প্রথম স্থানের অধিকারী, সিমোন ছিলেন দ্বিতীয় স্থান অধিকারী। বোভোয়ার পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষকতাকে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়; ফরাসি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাকে ফরাসি ভাষায় বলা হয় লিসে।

বিশ শতকের প্রথম অর্ধাংশ ছিল প্রাচ্যের ন্যায় পাশ্চাত্যের নারীদের জন্যও অন্ধকার সময়। পাশ্চাত্যের নারীরাও বন্দী ছিলেন গৃহের অভ্যন্তরে। নারী-জীবনের আদর্শরূপে তুলে ধরা হয়েছিল মাতৃত্বকে। জননী-জায়া কন্যা কোনো রূপেই নারী পুরুষের সমান মর্যাদা পেতেন না সেই সময়ে। এই অন্ধকারকে ভেদ করেই প্রকাশিত হয়েছিল দ্য বোভোয়ারের *The Second Sex*, পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় নারীর অবস্থানের এক ধ্রুপদী, দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক ভাষ্য। গ্রন্থটি সমকালীন ফ্রান্সে তীব্র সমালোচিত হয়। বিশ্বের বহু দেশ সম্বন্ধে গভীর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলেও এই গ্রন্থে তিনি চিত্রিত করেছেন ফরাসী নারীদের জীবনধারাকে, তাদের পরিস্থিতিকে, তাদের স্বপ্ন, চিন্তাভাবনা, আনন্দকে। তার সেই দর্শনের প্রদীপ্ত আলোকে বিশ্বের সব দেশের নারীদের খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধা হয় না। এখানেই এই গ্রন্থের সার্থকতা। গ্রন্থটির মূল নাম *Le Deuxième Sexe* গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় *The Second Sex* নামে, অনুবাদক – H.M. Parshley। এই অনুবাদটি অনুবাদ-সাহিত্যের অন্যতম সেরা অবদান বলে মনে করেছেন অনেক সাহিত্যিক, সমালোচক,

অনুবাদক। বর্তমানে গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত, বহু প্রচলিত ও প্রশংসিত। গ্রন্থটি দুটি খন্ডে বিভক্ত। গ্রন্থটির প্রথম খন্ডে সিমোন দ্য বোভোয়ার জীববৈজ্ঞানিক তথ্য, মনঃসমীক্ষণগত দৃষ্টিকোণ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর অদৃষ্ট কি আদৌ পূর্বনিয়ন্ত্রিত, —এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন সমকালীন কিংবদন্তীতে, উপন্যাসে, নারীর স্থান। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খন্ডে তিনি নারী-জীবনের বিভিন্ন স্তরকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন—শৈশবে নারী, তরুণী, বিবাহিতা নারী, মাতৃত্ব ও নারী, বারাঙ্গনা ও হেতাইরারূপে নারী এবং প্রৌঢ়ত্বে নারী।

সিমোন দ্য বোভোয়ারের নারীবাদী তত্ত্বের আলোকে নারীর জীবনের বিভিন্ন স্তরগুলিকে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। এই আলোচনা থেকে আমরা সমসাময়িক পাশ্চাত্যে বিশেষত ফ্রান্সে নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারব এবং সিমোন দ্য বোভোয়ার-এর নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও বিশদ পরিচয় পাওয়া যাবে এই আলোচনায়।

শৈশবে নারী

এই পর্যায়ের শুরুতেই দ্য বোভোয়ার বলেছেন— "One is not born, but rather becomes, a woman."[৫] অর্থাৎ নারী হয়ে কেউ জন্ম নেয় না, নারী হয়ে ওঠে। সামগ্রিকভাবে সভ্যতাই সৃষ্টি করে পুরুষ ও নপুংসক-এর মাঝামাঝি প্রাণীটিকে, যাকে আমরা নারী বলি। শৈশবে মানুষ হাত দিয়ে, পা দিয়ে চোখ-কান দিয়ে পৃথিবী কে চেনে, যৌনাঙ্গ দিয়ে নয়। ফলে লিঙ্গ নির্বিশেষে শিশু একই প্রকার আকর্ষণ ও আনন্দ বোধ করে জাগতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি। স্তন্যপান তাদের কাছে সবচেয়ে মনোরম অনুভূতির উৎস। উভয়ই মাতৃ দেহের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং মাকে আঁকড়ে থাকে। শ্রীমতি বোভোয়ারের মতে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত বালিকা ভাইয়ের ন্যায় শক্তিশালী হয় এবং তাদের মানসিক ক্ষমতাও একই প্রকারের হওয়ায় যেকোনো প্রতিদ্বন্দিতায় উভয়ই একসঙ্গে লিপ্ত হয়। এই সময় উভয়েই অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে ঈর্ষা করে মায়ের কাছাকাছি এলেই। ঈর্ষাবশত বালক-বালিকারা বড়দের খুশি করতে, হাসাতে, বড়দের প্রশংসা পেতে নানা ভাবভঙ্গির আশ্রয় নেয় যা সহায়তা করে বড়দের কাছে কাছে থাকতে। বড় হওয়ার সাথে সাথে মাতার শরীর থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে শিশু। সেই বিচ্ছিন্নতাই তখন তার ক্ষোভ ও হতাশার কারণ হয়। মাতৃক্রোড় থেকে নিজস্ব বিছানায় শোয়ার ভয়ে তারা ত্রস্ত থাকে।

অন্যদিকে ছোটবেলায় বালিকারা আদর পেতেই থাকে, সে মায়ের পোশাকের আশ্রয়েই থাকে। তার চুল পরিপাটি করে বেঁধে দেয়া হয়, তাকে ছোট ছোট মিষ্টি পোশাক পরানো হয়, তার আদুরে ভাবে বড়রা মজা পায়। এই সকল শারীরিক সংস্পর্শ, আদর ভরা চাহনি শিশুকন্যাকে ঘিরে থাকে, তাকে নিঃসঙ্গতায় ভুগতে দেয়না। তুলনায় ছোট বালকটির আদুরেপনাতে মোটেই প্রশ্রয় দেয়া হয়না। তার মন ভোলানোর চেষ্টা, ভান বিরক্তির কারণ হয়। তাকে বলা হয়— 'পুরুষ চুম্বন চাইতে পারে না', 'পুরুষ আয়নায় নিজেকে দেখে না', 'পুরুষকে কাঁদতে নেই' —এসবের দ্বারা তাকে একটি পুরুষ হয়ে উঠতে বলা হয়। বড়দের থেকে স্বাধীন হওয়ার অনুমোদনে সে ভীত হয়ে পড়ে। সমবয়সী বালিকাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে দেখে সে ভাবতে শুরু করে মেয়ে হলেই বোধহয় ভালো ছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ সেই বালিকাদের মতো যত্ন প্রত্যাশা করতেই থাকে। শৈশবে বালক-বালিকা নির্বিশেষে একই পোশাক পরানো হয় অনেক সময়, একটু বড় হলে বালকদের পুরুষের ন্যায় পোশাক পরানো শুরু করা হয়, চুল কেটে ছোট করে দেয়া হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এভাবে নারীর ন্যায় থেকে যেতে চায়। শ্রীমতি বোভোয়ারের মতে এটি সমকামিতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটি ধরণ।

বালকটি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোঝানো হয় পুরুষদের থেকে সমাজ উৎকৃষ্টতর ব্যবহার দাবি করে, কারণ তারাই উৎকৃষ্টতম। তাকে কঠিন পথ অনুসরণ করতে হবে, মাতৃস্নেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ছেলেমানুষি ছেড়ে পুরুষ হয়ে উঠতে হবে। এভাবে তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় পুরুষত্বের অহংকার। সে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৌরব অর্জন করত না তার পুরুষ হওয়ার জন্য, পারিপার্শ্বিক মানুষের আচরণ থেকেই সে গর্ববোধ করতে শুরু করে নিজের যৌনাঙ্গের প্রতি, যৌন পরিচয়ের প্রতি।

অন্যদিকে শিশু বালিকার যৌনাঙ্গের প্রতি এহেন সচেতনতা একেবারেই অনুপস্থিত। ধাত্রী, মাতা সকলেই তার যৌনাঙ্গকে ঢেকে রাখে কেবল[৬]। এ যেন এক লজ্জার বিষয়, একে মনুষ্য চোখের আড়ালে রাখাই শ্রেয়। এক্ষেত্রে অনুপস্থিত সেই ডাকনামে ডাকা কিংবা চটুল আলাপও। এক অর্থে যেন কোনো যৌনাঙ্গ নেই-ই তার।

একই সঙ্গে বেড়ে ওঠা বালকের যৌনাঙ্গের এহেন আস্ফালন, অন্যদিকে বালিকার যৌনাঙ্গের প্রতি নিকৃষ্টতর বিরূপভাব বালিকার মননে প্রবেশ করে তার মধ্যে নিকৃষ্টতার বীজ বুনতে শুরু করে। দাড়িয়ে প্রস্রাব করার ভঙ্গিমাটা শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করে সে কেননা ভঙ্গিমাটির মধ্যে এক ধরনের বিশেষ স্বাধীনতা বিদ্যমান[৭]।

পুরুষ হওয়ার এই বিমূর্ত গৌরব যখন মূর্ত pennis এ পর্যবসিত হয়, তখন নারীর বিমূর্ত যৌনতা তথা নিকৃষ্টতর যৌন পরিচয় পর্যবসিত হয় পুতুলে, যাকে ফরাসি ভাষায় শ্রীমতি বোভোয়ার বলেছেন 'poupée'। পুতুলটিকে সে তেমন করেই সাজায় যেমন করে বালিকাকে মা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। সাজসজ্জার ঘনঘটা অজান্তেই বালিকাটিকে পণ্যে পরিণত করে। অন্যকে প্রলুব্ধ করতেই হবে —এই হয়ে ওঠে তার ও তার পুতুলের জীবনমন্ত্র। এই পুতুলটিকে সে সজ্জিত করে তোলে নিজের ন্যায়ে। একটু বড় হতেই মা তার বালিকাদের ঘরকন্নার কাজ শেখাতে শুরু করেন। সে ভ্রাতাদের ঈর্ষা করতে শুরু করে তাদের স্বাধীনতর জীবনের জন্য। তাঁর মনে হয় ভ্রাতাগণের জীবন তার চেয়ে অনেক বেশী নির্ঝঞ্ঝাট ও প্রাণবন্ত। ইতিমধ্যে বালিকাটি আত্মীয়-পরিজনদের থেকে 'পুরুষ হয়ে জন্মালেই ভালো হত' এই অমোঘ বাণীও শুনে ফেলে। পুরুষের জীবনকে উৎকৃষ্টতর ভাবতে শুরু করে। লেখিকা উল্লেখ করেছেন ফ্রান্সে সহশিক্ষার স্কুলগুলিতে বালক গোষ্ঠী প্রায়শই বালিকা গোষ্ঠীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। ইচ্ছাকৃত নির্যাতন করে থাকে। বালিকারা অধিকতর সময় মায়ের সঙ্গে কাটাতে কাটাতে মায়ের নিয়তিকেই মেনে নেয়। পিতার সার্বভৌম কর্তৃত্বকে তারা নির্বিচারে গ্রহণ করে। পুরুষের এই কর্তৃত্বকে রহস্যময় বলেন লেখিকা। আক্ষেপ করেছেন করুণ স্বরে যে প্রাচীনকাল থেকেই পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব অভিভূত করে, পারসিউস, হারকিউলিস, ডেভিড নেপোলিয়ন। কিন্তু বিখ্যাত নারী চরিত্রগুলি পুরুষদের তুলনায় নিতান্তই বিবর্ণ, অধিকাংশই পুরুষের গৌরবে গৌরবান্বিতা।

প্রাচীন রূপকথা কিংবদন্তিতেও নারীকে অঙ্কন করা হয়েছে পরী, সমুদ্র কুহকিনী, ডাইনি রূপে। অপরদিকে পুরুষ দেশ উদ্ধার করে, নারীকে বিপদ থেকে রক্ষা করে, নারীকে জয় করে বিপুল পরাক্রমে, বিশ্ব পর্যটনে চলে যায়, বনে জঙ্গলে বাস করে ফল খেয়ে। শিশু বালক বালিকারা এই রূপকথাগুলি পড়ে পড়েই বড় হয় এবং সমাজে নিজের অবস্থানকে বুঝে নিতে শুরু করে এবং সমাজের প্রত্যাশিত ভূমিকায় অভিনয় করে চলে আজীবন। বলাই বাহুল্য কন্যার এবং পুত্রের বড় হয়ে ওঠার পেছনে পিতা-মাতার ভূমিকা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে খুব আলাদা নয়। পিতা ও মাতা উভয় ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় সন্তানকে বড় করে তোলেন। বড় করে তোলার প্রক্রিয়াটির মধ্যে রয়েছে লিঙ্গবৈষম্যের বীজ।

তরুণী

The Second Sex গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়টি হল— *The Young Girl*. যুবতীরূপে নারীর মানসিক ও সামাজিক অবস্থান এই অধ্যায়ের উপজীব্য। অধ্যায়ের শুরুতেই লেখিকা বলেন -"Her youth is consumed in waiting, more or less disguised....The adolescent boy, too, undoubtedly dreams of women he longs for her; but she will never be more than an element in his life: she does not sum up his destiny."[৮]।

শৈশব কাল থেকেই কিশোরীকে তার মাতা পিতা আত্মীয়স্বজনেরা সুন্দর সাজসজ্জা করার এবং কোনো এক পুরুষের কাছে নিবেদিত হওয়ার পাঠ পড়িয়ে থাকেন। তাকে বলেই দেয়া হয় তার নিয়তি হল নিজেকে সমর্পণ করা। প্রথমে এই সত্যের বিরোধিতা করলেও গুরুজনদের কথায় এবং সমবয়সী বান্ধবীদের সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে সেও কোনো এক ঈশ্বররূপী পুরুষের কাছে নিবেদিত হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। কিশোরও দেখে কোনো এক শান্ত, ভদ্র, শিষ্টাচারী

তরুণীর স্বপ্ন, যার জীবনের উদ্দেশ্যই হবে সে। অধিকাংশ কিশোর মাতাকে খোঁজে তার ভাবি প্রেমিকার মধ্যে। মাতার জীবন কেন্দ্রীভূত হয় তার পিতা এবং তাকে ঘিরে। মাতাকেই শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য করে সে প্রত্যাশা করে তার স্বপ্নের নারীর জীবন হবে কেবল তাকেই ঘিরে। কিন্তু সে কখনো নিজেকে নিবেদন করার স্বপ্ন দেখেনা। পুরুষের জন্য নারী তার জীবনের অংশমাত্র, নিয়তি নয়। অপরদিকে তরুণী পুরুষকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে অনবরত। এই শিক্ষা সে তার মাতা, ভগ্নীদের থেকে আয়ত্ত করে। শ্রীমতি বোভোয়ার বলেন সমসাময়িককালে আমেরিকার কলেজগুলোতে কোনো সহপাঠিনীর সামাজিক মর্যাদা পরিমাপ করা হত তার অভিসারীর সংখ্যা দিয়ে। শিশু হিসেবে শিশ্নের (pennis) অভাব, ভ্রাতাদের মত স্বাধীনতা পাওয়ার অভাব নারীকে যৌবনে আত্মসর্বস্ব করে তোলে। সে বুঝতে পারে পুরুষের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার অস্ত্র তার রূপ ও যৌবন। একসাথে এই হতাশা ও প্রতিশোধ স্পৃহা অনেক সময় নারীর স্নায়বিক দুর্বলতার কারণ হয়। সে তার শরীরকে কখনো হাতিয়ার মনে করে কখনো বা দুর্বহ ভার। কখনো সে প্রলুব্ধ করে ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো পুরুষকে আবার সেই পুরুষই আগ্রহ প্রকাশ করলে তাকে প্রত্যাখ্যান করে। তার প্রেম-আসক্তি ভয়ের আকার ধারণ করে এবং সে দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করে কাঙ্ক্ষিত পুরুষের থেকে। কিংবা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে। এজন্যই সে অনেক সময়ে বিবাহিত পুরুষদের প্রেমে পড়ে। যেখানে কোনোভাবেই কোনো ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নেই, সেখানেও সম্ভাবনা তৈরি করে সে মনে মনে সাফল্য অনুভব করে এবং তার বিবাহিত স্ত্রীকে পরাজিত করে সুখানুভব করে। এসকল কারণেই তরুণীর প্রায়শই তার ছেলেবেলায় সাথীদেরকেও ঈর্ষা করে। তারা তাদেরকে পুরুষদের প্রলুব্ধ করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগী মনে করে। এভাবেই তারা নিজেদের অগোচরেই পণ্যে পরিণত হয়। প্রেমের ক্ষেত্রে যুবতী গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করে, কারণ তাদের মায়েরা তাদের নির্দেশ দেয় তারা যেন উদ্যোগ না নেয় প্রথমে, প্রেমে কিংবা যৌনতায়। পুরুষেরা অতিরিক্ত সাহসী, স্পষ্টবাদী নারী পছন্দ করে না। এ প্রসঙ্গে লেখিকা বিখ্যাত সাহিত্যিকদের উপন্যাসের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন শেষ পর্যন্ত স্বর্ণকেশী, নিরীহ, অপদার্থ নায়িকারাই জয়ী হয় পুরুষালী স্বভাবের শ্যামাঙ্গীদেরকে হারিয়ে[৯]। আসলে সাহিত্যে উপন্যাসের সিনেমায় আদর্শ নারীকে হতে হবে দুর্বল, বাধ্য এবং অপদার্থ। তাকে দমন করতে হবে স্বতস্ফূর্ততা, আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা। শ্রীমতি বোভোয়ার ফরাসি নারীদের প্রেক্ষিতে, ফরাসি সমাজের প্রেক্ষিতে এই বিবরণ দিয়েছেন বটে। কিন্তু নারীর এই আদর্শ রূপ ভারতীয় চলচ্চিত্রে, উপন্যাসেও উপস্থাপিত হয়ে থাকে। আসলে দেশকাল নির্বিশেষে আমাদের মগজে আদর্শ নারীকে অপদার্থ, দুর্বলতর ও ভীরুরূপেই প্রতিস্থাপন করে পুরুষতন্ত্র। অন্যদিকে এর বিপরীতটা ঘটলে অর্থাৎ তরুণী যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলাফেরা করে করে, জোরে কথা বলে, বিশেষ আবেগপ্রবণ না হয়, তাহলে সেগুলিকে অশোভন বলে মনে করে সমাজ। সেই সকল তরুণীদের পুরুষেরা ভাবি স্ত্রীর ভূমিকায় কখনোই দেখে না, কিন্তু রাস্তাঘাটে যৌন প্রস্তাব দেয়। এহেন ব্যবহার নারীকে বার্তা দেয় যে, নারীর এই আচরণগুলি মন্দ। তাকে গড়ে উঠতে হবে শালীন, নিবেদিতপ্রাণ, পুরুষের যোগ্য ভাবী স্ত্রীরূপে। তরুণী জীবনের আদর্শ হয়ে ওঠে একটি স্বামী লাভ করা কিম্বা কমপক্ষে একটি স্থির প্রণয়ী পাওয়া। অন্যদিকে তরুণ তখন নিজের ভবিষ্যৎকে শিক্ষায়, পেশাগত প্রশিক্ষণে, খেলাধুলায় সম্ভাবনাময় করে তোলে। শ্রীমতি বোভোয়ার বলেন তরুণীকে নিজের ভবিষ্যৎ পুরুষের হাতে তুলে দেওয়ার বদলে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে লেখাপড়ায়, খেলাধুলায়, রাজনৈতিক-সামাজিক তৎপরতায়। তবেই সে মুক্তি পাবে পুরুষ ভাবনার আবিষ্টতা থেকে। তবুও একজন স্বাধীন ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেতে তাকে তার সমবয়সী যুবকের চেয়ে অনেক বেশি কাঠ-খড় পোড়াতে হবে, কারণ তার পরিবার ও আত্মীয়রা তাকে কিছুতেই সমর্থন করবে না। তবু তাকে নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যেই মগ্ন থাকতে হবে। নিজেকে অর্থনৈতিকভাবে সফল করে তুলতে হবে। পুরুষের বাধ্য স্ত্রী হওয়ার সহজ রাস্তা পরিত্যাগ করতে হবে, তবেই আসবে সাম্য।

বিবাহিত নারী

The Married Woman শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীমতি বোভোয়ার বলেন, "Marriages then, are not generally founded upon love. As Freud put it: 'The husband is, so to speak, never more than a substitute

for the beloved man, not that man himself'. And this dissociation is in no way accidental. It is implied in the very nature of the institution, the aim of which is to make the economic and sexual union of man and woman serve the interest of society, not assure their personal happiness."[১০]। লেখিকার মতে বিবাহ হল নারীর সেই নিয়তি যা সমাজ তাকে ঐতিহ্যগতভাবে দান করে। বিয়ের সর্বদাই নারী ও পুরুষের কাছে বেশ ভিন্ন ব্যাপার। দুটি লিঙ্গ পরস্পরের কাছে প্রয়োজনীয়, কিন্তু এই প্রয়োজন কোনো সময় তাদের মধ্যে পারস্পরিকতার অবস্থা সৃষ্টি করেনি। সামাজিকভাবে পুরুষ এক স্বাধীন পরিপূর্ণ মানুষ। সর্বপ্রথম তাকে গণ্য করা হয় একজন উৎপাদকরূপে। আমরা দেখেছি প্রজননের ও গৃহকর্মীর ভূমিকায় সীমাবদ্ধ করা হয়েছে নারীকে। বিবাহিত নারী দাসী হিসেবে কিংবা পোষ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কোনো পরিবারে, যেখানে আধিপত্য থাকে পুরুষের। তরুণীর স্বামী পছন্দ করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সবসময়ই ছিল খুব সীমিত। লেখিকা বলেন সমকালীন ফ্রান্সে সম্বন্ধ করে বিবাহ রীতি ছিল অপ্রতুল।

বিবাহের উদ্দেশ্য দুটি। তার প্রথমটি হচ্ছে, সমাজকে সন্তান দিতে হবে নারীকে। দ্বিতীয়তঃ নারীর উপর আরোপ করা হয় পুরুষের যৌন ক্ষুধা তৃপ্ত করা ও গৃহস্থালি সামলানোর ভার। বংশ রক্ষা করতে হবে বলে নারীর বহু বিবাহ সমাজে নিন্দনীয় এবং পুরুষের বহুবিবাহ সবসময়ই খোলাখুলিভাবে অনুমোদিত।

বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েটি থাকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয়। তাকে বিয়ে দেওয়া হয়। তার বাবা-মা তার বিয়ে দেয়, ছেলেরা বিয়ে করে বা তারা পত্নী গ্রহণ করে। নারীটি গ্রহণ করে পুরুষের নাম, অন্তর্ভুক্ত হয় পুরুষটির ধর্মে, তার শ্রেণীতে, তার পরিবারে, তার সমাজে। সে হয়ে ওঠে পুরুষটির অর্ধাঙ্গিনী। সামাজিক প্রথা অবিবাহিত নারীর যৌন স্বাধীনতা অর্জনকে অন্যায় মনে করে। লেখিকা বলেন, সমকালীন ফ্রান্সে স্ত্রীর ব্যভিচারকে গণ্য করা হত অপরাধ রূপে। অথচ কোনো আইন নারীর স্বাধীন প্রেমকে নিষিদ্ধ করে না, তবুও বিবাহিতা নারী যদি কোনো প্রেমিক পেতে চায় তাহলে প্রথমে তাকে বিবাহিত হতে হত, কারণ বিবাহ পূর্ববর্তী জীবনে সে থাকে বিবাহিত জীবনের চেয়েও বেশী ঘেরাটোপের মধ্যে। এমনকি আজও অনেক মধ্যবিত্ত তরুণী বিয়ে করে শুধু স্বাধীন হওয়ার জন্য। তাই শ্রীমতি বোভোয়ার বলেন বিয়ের সাধারণত প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি একটি যৌন চুক্তি মাত্র। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃতিতেই নিহিত আছে পুরুষ ও নারীর আর্থিক ও যৌন মিলনের মাধ্যমে সমাজের স্বার্থ রক্ষা করা,তাদের ব্যক্তিগত সুখ সুনিশ্চিত করা নয়।

গার্হস্থ্য কর্মগুলি যেমন ঘর ধোয়ামোছা, ইস্ত্রি করা, ঝাঁট দেয়া, পোশাকের আলমারি তলা থেকে কাগজের টুকরো খুঁজে বের করা —এই সকল কাজ গৃহিণীর জন্য নির্দিষ্ট থাকে। নারীকে উন্নততর পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানানো হয় না। তার এলাকা নির্দিষ্ট। সে সমস্ত অশুভ শক্তির সাথে চুপিসারে লড়াই করে। তাকে অন্তহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয় ধুলো, দাগ, কাদা ময়লা আর নিজের নিয়তির সাথে। বোভোয়ারের লেখায় পাই সমকালীন ফ্রান্সে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্রচলিত থাকলেও সেই বিবাহবিচ্ছেদের জন্য মামলা করা ছিল খুবই অপ্রচলিত ব্যাপার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারী সামাজিক চক্ষু লজ্জার ভয়ে অত্যাচারী স্বামী এবং স্বামীর পরিবারকেই নিয়তি হিসেবে মেনে নিতেন।

নারী ও মাতৃত্ব

নারীর জন্য মাতৃত্ব একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা। মাতৃত্বের জন্য প্রকৃতি রচনা করেছে নারীকে। নারীর প্রতি মাসের ঋতুস্রাব সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। তাহলে মেয়েদের ব্যক্তি স্বরূপ-এর অন্বেষণে তার শরীরের প্রাকৃতিকতাও একটা বাধা। সে অন্বেষণে প্রথমে তাকে স্থির করে নিতে হয় সে মাতৃত্ব চায় কিনা। প্রাকৃতিক এই ঘটনটিকে মাত্র নিছক প্রাকৃতিক রাখেনি পুরুষতন্ত্র। তার ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকে পুরুষতন্ত্রের। মাতৃত্ব যদি চূড়ান্ত নিয়তি হয় তবে সে নিয়তিও পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিবাহ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। বিজ্ঞান যখন জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, তখন সমাজ কিংবা রাষ্ট্র তাতে সহজে সম্মতি দেয়নি কেননা তাহলে তো মাতৃত্বকে মেয়েরাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সব দেশেই বহু আন্দোলন করে মেয়েরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করেছে।

সিমোন আলোচনা করেছেন তার কঠোরতম পথ ভ্রুণহত্যার বিষয়ে। ভ্রুণহত্যা আইন সংগত ছিল না অধিকাংশ দেশে। ভ্রূণহত্যা আইন সঙ্গত করার জন্য ফ্রান্সে যে আন্দোলন হয়, তিনি তাতে যোগ দেন। মাতৃত্বকে যে পুরুষই নিয়ন্ত্রণ করে, ভ্রূণ হত্যা তারই প্রমাণ – সিমোন দেখিয়েছেন। পুরুষরা শ্রেণীগতভাবে ভ্রূণ হত্যার তীব্র বিরোধী অথচ ব্যক্তিগতভাবে ভ্রূণহত্যা তারাই করতে বলে তার অবৈধ সম্পর্কের প্রমাণ লোপাট করার জন্য। সমাজের এই বিষয়ক মানসিকতার আরও একটা গোলমেলে দিক নির্দেশ করেছেন সিমোন। যে ভ্রূণ রক্ষা করার জন্য সমাজের এত মাথাব্যথা, সেই ভ্রূণ যখন পূর্ণতা পায় জন্মগ্রহণের পর, সেই সমাজই তাকে ঘৃণায় সরিয়ে রাখে। অনেক ক্ষেত্রে পিতৃপরিচয়হীন শিশুকে যারা যন্ত্রণা দেয় নানাভাবে, তাদের কোনো শাস্তি নেই। যে পিতা তার সন্তানকে স্বীকৃতি দেয় না শাস্তি নেই তারও। শাস্তি শুধু অবৈধ গর্ভধারিণী মেয়েটির। অবৈধ সন্তান প্রসব করার মত মনের জোর থাকে না, তাই অপরাধ জেনেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভপাত করাতে হয় মেয়েটিকে। মাতৃত্বে মেয়েদের চূড়ান্ত সার্থকতা একথা শুনে শুনে যে মেয়ে বড় হয়েছে, তাকে চোরাপথে শারীরিক ঝুঁকি নিয়ে মাতৃত্বের অবসান ঘটাতে হয়। গর্ভপাত এখন অনেক দেশেই আর বেআইনি নয়। শুধু প্রতারণার শিকার হলেই যে মেয়েরা এখন গর্ভপাত করাতে চায় তাও নয়। তার শরীরের ওপর তার পূর্ণ অধিকার আছে সে কথা জানাতেও সে মা হতে অস্বীকার করতে পারে, গর্ভ নষ্ট করতে চাইতে পারে। আজকের মেয়েরা যারা নিছক সংসারে আবদ্ধ না থেকে কোনো কাজ করতে চায় বাইরের জগতে, মাতৃত্ব তার কাছে অনভিপ্রেত হতেই পারে। বিবাহের বন্ধন মানলেও মাতৃত্বের বন্ধন তার কাজের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনার শামিল বলে ভাবতে পারে সে। প্রয়োজনে গর্ভপাত তাকে করাতেই হয়। সিমোন নিজেও অবিবাহিত থাকার সিদ্ধান্তের সঙ্গে মাতৃত্বহীনতার সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন।

ভালো মা, লক্ষ্মী গৃহবধূ হলে সমাজের কাছ থেকে পরিবারের কাছ থেকে হাততালি জোটে হয়ত। কিন্তু ওই পর্যন্তই। হাততালিতে সাময়িক বুক ফুলে উঠলেও একদিন গভীর অবসাদের শিকার উঠতে হয় মেয়েদের। সিমোন এ বিষয়ে সচেতন করতে চেয়েছেন মেয়েদের। পুরুষের মতই মেয়েদেরও প্রয়োজন আছে সত্তা সন্ধানের, বলতে চেয়ে ছিলেন সে কথা। তার মানে মেয়েরা মা হবে না, স্ত্রী হবে না, এমন কথা তিনি বলতে চাননি। পুরুষ কি স্বামী হতে চায় না? পিতা হতে চায় না? কিন্তু সেসব ভূমিকার বাইরেও সে একটি আত্মপরিচয় সন্ধান করে। এটি একান্ত জরুরি মেয়েদের ক্ষেত্রেও। বধূ, মাতার জীবনযাপনের বাইরে নিজের হয়ে ওঠার পথ খুঁজে নেওয়া প্রয়োজন মেয়েদের। অন্যথায় শেষজীবনে তাকে ঘিরে ধরে অন্তহীন হতাশা।

বারাঙ্গনা বা হেতাইরা রূপে নারী

দ্য বোভোয়ার মনে করেন বিবাহিত নারীর ও বারাঙ্গনার অবস্থার সরাসরিভাবে খুব বেশি পার্থক্য নেই। উভয়েই পুরুষের ভোগ্যপণ্য যৌনদাসী। তবে বিবাহিতা নারীকে পুরুষ বংশরক্ষার তাগিদে বিচক্ষণবশত সতীত্বের মন্ত্রে দীক্ষিত করে। কিন্তু সে নিজে বাস্তবে অসতী নারী কে কামনা করে। এ প্রসঙ্গে বোভোয়ার উদাহরণ সহ দেখিয়েছেন যে, পারস্যের রাজারা ভোজ উৎসবে আমন্ত্রণ জানাতেন তাদের স্ত্রীদের। কিন্তু যখন তাদের মন প্রাণ জুড়ে মদিরা, তাদের উত্তেজিত করে তুলত, তখন তারা স্ত্রীদের অন্দরমহলে পাঠিয়ে অন্য নারীদের আনিয়ে নিতেন, যাদের তারা ততটা সম্মান করতে বাধ্য নন[১১]। গীর্জার পাদ্রীরা যেমন প্রাসাদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পয়ঃপ্রণালী প্রয়োজন বলে মনে করতেন, তেমনি সমাজের নারীদের একাংশকে রক্ষা করা এবং নিকৃষ্ট সমস্যা প্রতিরোধ করার জন্য আবশ্যক আরেক অংশকে উৎসর্গ করা[১২]।

লেখিকার মতে অর্থনৈতিক দিক থেকেও বিবাহিতা নারী ও বারাঙ্গনার অবস্থানের মধ্যে সাযুজ্য বর্তমান। *La puberté* গ্রন্থে Antonie Marro-এর উক্তিকে উদ্ধৃত করে লেখিকা বলেন, যারা বারাঙ্গনার রূপে নিজেদের বিক্রি করেন এবং যারা নিজেদের বিক্রি করেন বিয়েতে; তাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য চুক্তি ও সময়ের দৈর্ঘ্যের। খুবই স্পষ্ট বোভোয়ারও এই মত পোষণ করেন। এর আগেও আমরা দেখেছি শ্রীমতি বোভোয়ারের মতে, বিবাহ একটি যৌন চুক্তি মাত্র। বিবাহিতা নারী ও যৌনকর্মী উভয়ের জন্যই যৌনকর্ম একটি সেবা। একজনকে একটি পুরুষ ভাড়া করে সারা জীবনের জন্য, অন্যজন নানা ব্যক্তিকে যৌন সেবা দিয়ে থাকেন অর্থের বিনিময়ে। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও বিদ্যমান। বিবাহিতা স্ত্রী নারী হিসেবে

সংসারে উৎপীড়িত হলেও সমাজে কিছুমাত্রও সম্মানিত হন। অন্যদিকে রক্ষিতার জীবন কাটে পুলিশের, দালালের এবং বহু বিকৃতকাম পুরুষের চোখ-রাঙানিতে। তবে বারাঙ্গনাই নারীর সব ধরনের দাসত্বকে একযোগে নির্দেশ করে। কেননা এটিই নারীর মুখোশ বিহীন প্রকৃত অবস্থান। "So long as the prostitute is denied the rights of a person, she sums up all the forms of feminine slavery at once."[১৩]।

বেশিরভাগ বারাঙ্গনা গৃহপরিচারিকা থেকে সেবাদাসীতে পরিণত হতেন। কেউ কেউ আবার অভাবে পিতা-মাতার মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য, কেউ কেউ প্রেমিক বা স্বামীর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এই বৃত্তি বেছে নিতেন। বারাঙ্গনা শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতি বোভোয়ার 'হেতাইরা' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। এই শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন সেই সকল নারীদের উদ্দেশ্যে যারা শুধু শরীর নয় বরং তাদের সমগ্র ব্যক্তিত্বটাকেই ব্যবহার করে শোষণের পুঁজি হিসেবে। তারা শিক্ষিতা, সৃষ্টিশীল। তবে শিল্পীরা সৃষ্ট কর্মের দ্বারা নিজেদের উত্তরণ ঘটিয়ে প্রদত্ত অবস্থাকে অতিক্রম করে যান। কিন্তু হেতাইরা মানবিক উত্তরণের কোনো পথ খুলে দেয় না, সে কেবল নিজের লাভের জন্য জগতকে সম্মোহিত করতে চায়। জাদুকরী ক্ষমতায় গ্রাস করতে চায় গোটা জগতকে।

হেতাইরা রূপে নারী সফল হয় কিছুটা স্বাধীনতা অর্জনে। বিভিন্ন পুরুষের কাছে নিজেকে ভাড়া দিয়ে সে কারো অধীন হয়না বরং নিজেকে বিক্রি করে সে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। বিবাহিত নারীরা নিজে অর্থোপার্জন করলেও সেই অর্থের উপর স্বামীর অধিকার থাকে। কিন্তু হেতাইরা স্বাধীন ভাবে নিজ উপার্জন উপভোগ করতে পারে। এই সকল নারীরা তাদের নারীত্বকে চূড়ান্ত সীমায় ব্যবহার করে প্রায় পুরুষের সমতুল্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। প্রথমে তারা পুরুষের কাছে কর্মরূপে সমর্পিত হয়, তারপর তারাই কর্তা হয়ে ওঠে। তারা আচরণ ও কথাবার্তায় স্বাধীন। তারা ভোগ করে বুদ্ধিবৃত্তিগত স্বাধীনতা। সবচেয়ে সম্মানিত শিল্পী, লেখকরা তাদের বেষ্টন করে থাকে।

এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, পুরুষের প্রিয় উপপত্নীদের কথা, যারা শক্তিধর প্রেমিকদের মাধ্যমে পৃথিবী শাসনে সব সময় অংশ নিয়েছে[১৪]। হেতাইরা নারী পুরুষের কাছ থেকে যে অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা লাভ করে তাতে সে তার নারীধর্মী হীনমন্যতার ক্ষতিপূরণ পেয়ে যায়। তবে একি প্রকৃত মুক্তি? কোনো পুরুষই তার চূড়ান্ত প্রভু না হলেও, পুরুষের প্রয়োজন তাদের জন্য জরুরী। রাজবনিতার যৌবনের প্রতাপ হারিয়ে ফেলে, যদি পুরুষ তার প্রতি আকর্ষণ হারায়। এমনকি চিত্রতারকাও পুরুষের সমর্থন হারালে মনে করে তাদের উজ্জ্বলতা হয়ে যাচ্ছে ম্লান। হেতাইরা একান্তভাবে নির্ভর করে তার দেহের উপর, যার মূল্য কমে যায় নির্মমভাবে, সময়ের সাথে সাথে। তার রূপ আসলে একটা ঠুনকো সম্পদ যা কিছুদিনের জন্য স্থায়ী হয়।

সিমোন দ্য বোভোয়ারের এই অধ্যায়টি পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় সুকুমারী দেবীর প্রাচীন ভারতে গণিকা প্রবন্ধটির কথা। সেখানে আমরা বারাঙ্গনাদের মধ্যে নানা স্তরের উল্লেখ পাই। প্রাচীন ভারতে হেতাইরার সমতুল্য অবস্থানে ছিলেন রাজগণিকারা। বৈদিক যুগের রাজগণিকাদের মধ্যে বসন্তসেনা, আম্রপালির কথা আমরা পাই আচার্যার লেখায়। এরা শিক্ষা-দীক্ষায়, ঐশ্বর্যে শহরের অন্যান্য নারীদের চেয়ে অনেক উঁচু স্থানে অবস্থান করতেন। তারাও সিমোন বর্ণিত হেতাইরার মতই সমাজের অন্যান্য নারীদের থেকে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতেন। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ গণিকাদের নিচে ছিলেন কৌশিকস্ত্রী, কুম্ভদাসীরা। এরা রাজপ্রাসাদে নিজের শিক্ষা অনুসারে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু এরা ছিল গৃহস্বামীর ভোগ্য। একই ভাবে দেখি সমসাময়িক ফ্রান্সে অধিকাংশ বারাঙ্গনা ছিলেন প্রথমে গৃহ পরিচারিকা এবং এরা গৃহস্বামীর ভোগ্য ছিলেন। এভাবেই তারা ধীরে ধীরে বারাঙ্গনা হয়ে ওঠেন অল্প সময়ের ব্যবধানে। যদিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধারণ বারাঙ্গনাদের স্থান ছিল রাজগণিকা ও হেতাইরাদের নীচে। পাশ্চাত্যে বারাঙ্গনারা তেমন সম্মানিতাও ছিলেন না। তাদের জীবন পুলিশের ও খদ্দেরদের চোখ-রাঙানিতে, দালালের প্রহারে কেটে যেত। তবে এদের মধ্যে হেতাইরা যথেষ্ট সম্মান পেতেন এবং বিখ্যাত শিল্পী গুণীজন পরিবেষ্টন করে থাকতেন তাদের।

তবে রূপ-যৌবন জীবিকা যাদের তাদের বয়স কালে উপার্জনের রাস্তা হয়ে আসত সীমিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্যান্য গণিকাদের দাসীবৃত্তিকে জীবিকা করে নিতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বৃদ্ধ-ভাতার উল্লেখ পাওয়া যায়

গণিকাদের জন্যে। কিন্তু সমসাময়িক ফ্রান্সে রাষ্ট্র আলাদা করে কোনো দায়িত্বই পালন করতো না গণিকা সমাজের প্রতি।

প্রৌঢ়ত্বে নারী

নারীর জীবনের এই পর্যায়টি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দ্য বোভোয়ার মূলত দুটি স্তরের উল্লেখ করেছেন—প্রাক প্রৌঢ় স্তর এবং প্রৌঢ় স্তর। প্রথম স্তরে নারী তার যৌবন চলে যাওয়ার, আকর্ষণ ক্ষমতা চলে যাওয়ার ভয়ে ত্রস্ত থাকে। এই সময়টায় পুরুষ থাকে তার উন্নতির শিখরে। কিন্তু নারী তখন ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে, নারীত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে ভীত হয়। তবে এর ব্যতিক্রম আছে। লেখিকা বলেন ঘরে-বাইরে ভারী কাজের সঙ্গে যুক্ত যেমন কৃষক নারীরা, শ্রমজীবী স্ত্রীরা নিরন্তর গর্ভধারণের জ্বালা থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করে। মোটামুটি ৩৫ বছরে নারীর নিজের শরীর নিয়ে, সমাজ ও পরিবারসৃষ্ট যাবতীয় অস্বস্তি থেকে মুক্ত হয়। এই সময়ে নারীর কামাবেগের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। সে তখন চায় তার যৌনকামনাগুলিকে তীব্রভাবে তৃপ্ত করতে। কিন্তু আয়নার দিকে তাকিয়ে সে হতাশ হয়। সে দেখে নিজের কামনা বাসনা বোঝার আগেই তার রূপ যৌবন বিগত প্রায়। তখন সে চুলের রং করে, ত্বকের চর্চা করে, অস্ত্রপ্রচার করে হলেও মৃতপ্রায় যৌবনকে খানিক দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করে সে। আবার অনেক সময় কিশোরী বেলার আদুরেপনা আর চঞ্চল হাবভাবে ফিরে গিয়ে সর্বতোভাবে সে তার নারীত্বকে করে অতিরঞ্জিত। স্বপ্নে কামাতুর ছায়ামূর্তিরা ভিড় করে থাকে তার। একের পর এক তরুণের প্রেমে পড়ে সে কিশোরীর মত ধর্ষিতা হওয়ার ভাবনায় তাড়িত হয়, বারাঙ্গনা বৃত্তি করার উন্মত্ত বাসনা তাকে পেয়ে বসে। তার নারীত্বের কামনা-বাসনার দোটানায় অনেক সময় ঘটতে পারে মনোবিকলন। এই বৈকল্য তাকে আত্মীয়-পরিজনের কাছে বিরক্তির পাত্র করে তোলে। যে নারী বৃদ্ধ হওয়া নিয়ে মনকে প্রস্তুত করতে পারে না তার রজঃনিবৃত্তির সমস্যাগুলি চলতেই থাকে আমৃত্যু পর্যন্ত। অনেক সময় এই বয়সে নারীরা নিজের কন্যার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রতিফলিত করতে চান আবার একসঙ্গে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখেন। শ্রীমতি বোভোয়ার বলেন এরা অনেক ক্ষেত্রে কন্যার পাণিপ্রার্থীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে কন্যাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে তারা। প্রৌঢ়ত্বের শেষ স্তরে নারী চূড়ান্ত নিঃসঙ্গতায় ভোগেন। পুত্র-কন্যা সকলেই ধীরে ধীরে নিজের জগত তৈরি করে নেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বার্ধক্যের দিনগুলির কথা ভেবে সন্তান দত্তক নেয় নারী। স্বামী এই সময় একটি সফল জীবন কাটিয়ে স্থিরতা খুঁজে পায়। তখন প্রৌঢ়া সময় কাটাতে কখনো উল বোনে, সেলাই করে। হয়ত উৎপন্ন দ্রব্যটি কাজে লাগবে না জেনেও সেগুলি বানিয়ে দাতব্য সংস্থায় দান করে বিশুদ্ধ আনন্দলাভ করে। সে আর বিশ্বের ওপর তার অধিকারকে বিস্তৃত করার চেষ্টা করে না। শুধু দূর করতে চায় তার অবসাদগ্রস্থতা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সচরাচর এইসময়ে বন্ধু স্থানীয় হয় অথবা বৃদ্ধ স্বামীকে সে দেখে উপদ্রব রূপে। প্রৌঢ় নারী বার্ধক্যে পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করেন যখন তার সেটার প্রয়োজনই থাকেনা। শ্রীমতি বোভোয়ার বলেন আসলে কোনো সময়ে নারী একই সঙ্গে স্বাধীন ও কার্যকর হয়ে উঠতে পারে না। "At no time of life does she succeed in being at once effective and independent."[১৫]।

সিমোন যেমন ঘরে বাইরে নারীর অক্রিয় ভূমিকটির চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, সাংখ্য দর্শনে জগতের অভিব্যক্তিতে প্রকৃতির ভূমিকাটিও সেই রূপ। সমাজে নারীর-পুরুষের মতোই সাংখ্য দর্শনের মূল তত্ত্ব দুটি — প্রকৃতি ও পুরুষ। পুরুষ তার সঙ্গিনী জড়াত্মিকা প্রকৃতির সাথে মিলিত হয়ে জগতের অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া শুরু করে। এই অভিব্যক্তি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, উদ্দেশ্যসাধক। পুরুষের ভোগ ও কৈবল্যের জন্যই প্রকৃতি জগতরূপে অভিব্যক্ত হয়। জগতের অভিব্যক্তিতে প্রকৃতির ভূমিকাটি যেমন একেবারেই নিষ্ক্রিয়, তেমনি সমাজে মাতারূপে, জায়া রূপে, তনয়া রূপে, প্রৌঢ়া রূপে নারীর ভূমিকাটিও একইরকম নিষ্ক্রিয়।

আসলে, নারীর যাপিত অভিজ্ঞতায় *The Second Sex* পাশ্চাত্যেই হোক বা প্রাচ্যে, আঠারো-উনিশ শতকেই হোক কিংবা একবিংশ শতকে, দেশ-কাল নির্বিশেষে সকল নারীদের আত্মসচেতন করে তোলে। প্রতিদিনকার জীবন সংগ্রামে সাহস যোগায়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও অধিকাংশ মেয়েই আজও মানিয়ে চলার শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দেয়। বিবাহকেই জীবনের লক্ষ্য বলে মানে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিবার থেকে তাকে শিক্ষিত করে তোলা হয় কেবল একটি শিক্ষিত সরকারি চাকুরে পাত্র জোগাড় করার উদ্দেশ্যে। আজও আমাদের সমাজের অধিকাংশের কাছেই গৃহবধূত্বই মেয়েদের পেশা;

শিক্ষার হার কম হওয়ায় অধিকাংশ নারীই অন্ন সংস্থানের জন্য স্বামীর মুখাপেক্ষী। যদিও home maker হিসেবে তাকে সম্মান করে না কেউই। কোনো কোনো মোটা আমদানির চাকরি পেতে গেলে মোটা ঘুষ দিতে হয়। মেয়েদের এই পেশার জন্যেও দিতে হয় ঘুষ, পণ যার আরেক নাম। এমন নয় যে গ্রন্থটি পড়লে মেয়েরা আত্ম সচেতন হয়ে উঠবে সহজেই। বরং আত্মজ্ঞানের গরজ যার আছে আজও তার কাছে গ্রন্থটি অবশ্যই পাঠ্য, দেশকালের ফারাক, অভিজ্ঞতা বিশ্বের অনেক ফারাক থাকা সত্ত্বেও।

তবু সিমোনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে সর্বজনীনতার। তিনি যখন মেয়েদের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলেন তখন সে অভিজ্ঞতার অনেকটাই তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির মেয়েদের যাপিত অভিজ্ঞতার চেয়ে আলাদা। তার লেখা পড়ে মুক্তিকামী তরুণীরা যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তেমনি মাতৃত্বের প্রতি, বিবাহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি তীব্র সমালোচিতও হয়েছেন। পরিবার উচ্ছেদের বদলে পরিবারের থেকে পিতৃতন্ত্রকে উচ্ছেদ করাও বিকল্প হতে পারত। আজকাল প্রাগ্রসর দেশগুলিতে পরিবারের গৃহকর্মে এবং সন্তান প্রতিপালনে পুরুষরাও সক্রিয় অংশগ্রহণ করা থেকে রেয়াত পান না। সিমোন সংসার কর্মে নিমজ্জিত নারীর পুনরাবৃত্তিময় জীবনের কথা বলেছেন। আজকের যুগে কিন্তু বহু নারীই কর্মরতা। অনেক ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী কেউই সময় পান না এই সাংসারিক কাজগুলো সম্পাদন করার। সে ক্ষেত্রে সেই কাজগুলি তথা সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করেন বেতনভোগী তৃতীয় কেউ। সন্তান প্রজননের জন্য ও সেই সন্তানকে সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশে বড় করে তোলার জন্য পারিবারিক জীবনের কিছু একটা কাঠামো যে লাগবেই, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তা সত্ত্বেও বোভোয়ারের রচনায় যেভাবে নারীর শরীর, মন এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাগুলির সুক্ষাতিসুক্ষ দিকগুলি ধরা পড়েছে, নারীবাদী আন্দোলন সংগঠনে ও নারীবাদী তাত্ত্বিক আলোচনার অগ্রসরে তার মূল্য অপরিসীম।

সূত্র নির্দেশ:

১. Parshley, H.M., (1997). *The Second Sex*, (trans.), Vintage, p. 302.

২. সরকার, মন্মথ, (১৯৪৪), পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি (বঙ্গানুবাদ), বর্মণ পাবলিশিং হাউস, পৃ. ২৯।

৩. *তদেব,* পৃ. ৫৭।

৪. *তদেব,* পৃ. ৫৮।

৫. Parshley, H.M., (1997). *op.cit.*, p. 301.

৬. Parshley, H.M., (1997). *op.cit.*, p. 306.

৭. Parshley, H.M., (1997). *op.cit.*, p. 308.

৮. Parshley, H.M., (1997). *op.cit.*, p. 368.

৯. Parshley, H.M., (1997). *op.cit.*, p. 376.

১০. Parshley, H.M., (1997). *op.cit.*, p. 487.

১১. Parshley, H.M., (1997). *op.cit.*, p. 620.

১২. *তদেব।*

১৩. Parshley, H.M., (1997). *op.cit.*, p. 621.

১৪. Parshley, H.M., (1997). *op.cit.*, p. 635.

১৫. Parshley, H.M., (1997). *op.cit.,* p. 660.